আদর্শ মুসলিম পরিবার

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

الأسرة المسلمة النموذجية

(باللغة البنغالية)

ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

এ বইটিতে শিশু শিক্ষার ধরন, শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মাতা-পিতার ভূমিকা ও দায়িত্ব, শিশুদের শিক্ষা কারিকুলাম এবং শিক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও সংস্কৃতিবিদদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ নিবন্ধে রয়েছে, পারিবারিক বন্ধন, বিবাহ, বিবাহ বন্ধন, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। তাই ইসলাম পরিবারের সংশোধন ও শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একটি শিশুই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। তার তা‘লীম-তরবিয়তের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের আগামী দিনের পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে। আমাদের এ প্রবন্ধে শিশু শিক্ষার ধরণ কেমন হওয়া উচিৎ, শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার

ব্যাপারে মাতা-পিতার ভূমিকা ও দায়িত্ব কী হওয়া উচিৎ, শিশুদের শিক্ষা কারিকুলাম এবং শিক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও সংস্কৃতিবিদ যারা রয়েছেন তাদের ভূমিকা কী ধরনের অবদান রাখা উচিৎ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ নিবন্ধে রয়েছে, পারিবারিক বন্ধন, বিবাহ, বিবাহ বন্ধন, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। আশা করব আমাদের এ লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার বিশেষ দিক ও সৌন্দর্যগুলো আমাদের মধ্যে ফুটে উঠবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব:

ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সত্যবাদী মুমিন' 'রক্ষণশীল প্রতিনিধি' এবং 'দৃঢ়-বিশ্বাসী' মানুষ তৈরি করা। আল্লাহর পরিচয় জানা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালিন মুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা একমাত্র পরিতৃপ্ত ঈমানী শক্তি দ্বারাই সম্ভব। প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হতে হবে। এছাড়াও সঠিক অনুভূতি, বাস্তবধর্মী কর্ম পদ্ধতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত ও বিশ্বাসের দৃঢ়টা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আবশ্যিক উপকরণ। কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে, এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এ জন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা তথা নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনোও ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালনের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এজন্যই পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আমাদেরকে তাই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে যাতে সঠিকভাবে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম শিশুদেরকে যথাযথ তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়। তাদের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি অপসারণ করা যায়। বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হিফাযত করা যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

“আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٤]

“যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

আল্লাহ আরও বলেন

﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩﴾

[لقمان: ١٣، ١٩]

“যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললেন: হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছর বয়সে। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকেই

এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে অবহিত করবো। হে বৎস, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর খণ্ডের গর্ভে অথবা আকাশে, অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন-ভেদ জানেন, সবকিছু খবর রাখেন। হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবুর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনোও দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পাদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াজ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আওয়াজ"। [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩-১৯]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾ [ابراهيم: ٣٩، ٤١]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের বার্ধক্য বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণ করেন। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমার রব! কবুল করুন আমাদের দো'আ। হে আমাদের রব আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৯-৪১]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢﴾ [البقرة: ١٣١، ١٣٢]

"স্মরণ করুন, যখন তাকে তার রব বললেন: অনুগত হও। সে বলল আমি বিশ্ব পালকের অনুগত হলাম। এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মারা যেও না"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩১-১৩২]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦﴾ [الاحقاف: ١٥، ١٦]

"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। যাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার রব! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয়

সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমরা এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হতো"। [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫-১৬]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

"তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচার-পূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্র-ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে রব তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٨٤ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ ٨٥ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦

يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٧﴾ [يوسف: ٨٣، ٨٦]

“এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হায় আফসোস ইউসুফের জন্য এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মারা না যান। তিনি বললেন: আমি তো তোমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪-৮৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ»

“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান[1]।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভালো। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি”।[2]

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন:

---

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২।

[2] ইবন মাজাহ ও হাকেম।

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

"চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে, (২) বংশ মর্যাদার কারণে, (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। অতএব, তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু'হাত ধূলি ধূসরিত (তথা উত্তম) হোক।

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

"যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে"।[3]

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪।

“তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।[4]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”[5]

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান- এটা আশ্চর্যের কোনোও বিষয় নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত

---

[4] আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩।

[5] তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫।

বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি এক দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে। এ জন্যই শিশুকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে। সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিৎরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিৎরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

পরিবার গঠনে শরী'আতের ভিত্তি ও পদ্ধতি:

পরিবার গঠনে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনে মানুষে স্বভাবসুলভ দিকগুলো সম্পর্কে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব ও একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা সম্পর্কে অনুধাবন করতে না

পারবে। কারণ, মানুষ যখন এ সকল বিষয়ে অনুধাবন করতে পারবে তখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে। আর যখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে, তখন পরিবার গঠন সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব বুঝাও তখন সহজ হবে।

অতএব, পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যের পরিপূরকমূলক দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই দায়িত্ব অর্পণ ও পরিবার পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও জৈবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

সাধারণত মানুষের মধ্যকার এ সম্পর্ক এবং বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এ ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দিক নির্দেশনাগুলো না বুঝার কারণে পরিবার গঠন ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও সম্পর্কের বিষয়ে ভুল করে থাকে। তারা মনে করে যে, পরিবারের সকলের দায়িত্ব ও সম্পর্ক সমান। ফলে তারা মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে। আর যখন স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে, তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণে বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন করে থাকে- যা শেষ পর্যন্ত পরিবারের মন্দ ডেকে নিয়ে আসে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের ফিৎরাত সম্পর্কে অনুধাবন না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

আর পরিবারের সদস্যদের পরস্পর সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা পরিবারের নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ভাই-বোন, তথা সকল সদস্যের মাঝে

ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। আর যখনই পরিবার থেকে সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা, ভালোবাসা, দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই বাবার সম্পর্ক মায়ের সাথে এবং ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বাবার সাথে তথা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একে অপরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার মানসিক, আর্থিক, জৈবিক, ও দৈহিক বিকাশে প্রয়োজনীয় তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। একটি শিশুর মানবিক আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক বিকাশ এবং একটি আদর্শ পরিবার গঠন তখনই সম্ভব, যখন পরিবারের সকল সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব আদায় করে বা আদায় করতে চেষ্টা করে।

পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তানের সাথে নারীর বৈষয়িক ও আত্মিক আবেগ ও দয়াময় সম্পর্ক তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক দুর্বলতা এবং নারীত্বের কামনা- বাসনা ও তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। এ জন্যই আল্লাহ নারীর হাতে জৈবিক প্রশান্তির লাগাম তুলে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এ জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর পুরুষ সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না, বরং নারী তার ইচ্ছায় জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর অবিচল থাকতে পারে। সে তার এ অবিচলতা ততক্ষণ পর্যন্ত হারায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তাকে দৈহিকভাবে স্পর্শ না করে বা দৈহিকভাবে স্পর্শ করার অনুমতি না দেয়। সুতরাং যখন একজন পুরষ নারীকে জৈবিক আবেগে স্পর্শ করে, তখন আর নারী তার জৈবিক ও বুদ্ধিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক ও কাম-দুর্বলতার কারণে একজন নারীর দৃষ্টি বরং

শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ও চিন্তা-ধ্যান তাকে জৈবিক-ভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। এমন কি অনেক সময় নারী তার বুদ্ধির মাধ্যমে একজন পুরুষকে তার প্রতি দুর্বল করে ফেলতে পারে। যার ফলে পুরুষ স্বাভাবিকভাবে নারী ও সন্তানদের প্রতি দুর্বল, নম্র ও দয়াপরবশ হয়ে পড়ে। এ সকল দিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী শরী'আত নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিবাহের মাধ্যমে বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের বংশ মর্যাদা ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মানবিক, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটে এবং নারী ও সন্তানদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এ জন্যই আল্লাহ পুরুষদেরকে নারী ও সন্তানদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও বহন করার ক্ষমতা দান করেছেন। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, গড়ে উঠে পরিবার। সেই পরিবারই হয় সন্তানের শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল। নিশ্চয় পুরুষকে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে নারীর তুলনায় সাহসিক ও শক্তিশালী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা পারিবারিক প্রয়োজনে নারী ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের লালন পালন ও পরিচালনা করতে পারে। নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল, নম্র, কোমল ও আবেগময়ী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরনির্ভরশীল দুর্বল শিশু ও আবেগময়ী পুরুষ তাদের কাছে শান্তি ও আশ্রয় নিতে পারে।

এ জন্যই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর নারীদেরকে তাদের শক্তি সামর্থ্য ও ইচ্ছানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে কাজ-কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা বাধ্য করা,

তাঁদের প্রতি যুলুম ও দুর্ব্যবহারের নামান্তর, যা শরী‘আত, মানুষের স্বভাব এবং নারী পুরুষের একে অন্যের পরিপূরক নীতির পরিপন্থী।

সতর:

মানুষের স্বভাব এবং নারীকে দুর্বল ও পুরুষকে সবল করে সৃষ্টি ইত্যাদির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইসলামে নারী-পুরুষের সতরের পার্থক্যের রহস্য অনুধাবন করা যায়। ইসলাম নারীর সতরের পরিমাণ বেশি এবং পুরুষের সতরের পরিমাণ কম বা স্বল্প-ভাবে নির্ধারণ করেছে।

এ ইসলাম নারীর প্রতি যুলুম করে নি, বরং নারীকে হিফাযত করেছে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক বিবেচনা করে পারিবারিক বন্ধনের ব্যবস্থা করেছে।

ইসলাম পুরুষদেরকে সীমিত পরিমাণ সতরের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে তাদের কাজ-কর্মে সমস্যা বা ব্যাঘাত না ঘটে, তেমনিভাবে পুরুষের সতরের পরিমাণ কম থাকাতে নারীর প্রতি বা মাতৃত্বের প্রতি ফিতনা যুলুম ও সীমা লঙ্ঘনের অবকাশ নেই বললেই চলে। কারণ, নারী স্বভাবগতভাবে জৈবিক বিষয়ে অধিক সংযমশীল। অপরদিকে পুরুষের তুলনায় নারীকে অধিক সতরের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে পুরুষের যুলুম ও জৈবিক সীমালঙ্ঘন এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নারী ও মাতৃত্বকে হিফাযত করা যায়। তেমনিভাবে পুরুষদেরকেও হিফাযত করা যায়। কারণ, স্বভাবগতভাবে নারীর তুলনায় পুরুষ জৈবিক বিষয়ে অধিক দুর্বল এবং আবেগপ্রবণ। এমনকি নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৃষ্টি পর্যন্ত পুরুষকে আকৃষ্ট ও দুর্বল করে ফেলতে পারে। এ জন্যই ইসলামী শরী‘আত নারী-পুরুষের এ রকম সতরের বিধান দিয়েছে। এটিই হচ্ছে ইসলামী শরী‘আতের নারী-পুরুষের সতরের ব্যবধানের রহস্য।

এ জন্যই ইসলামী শরী‘আত বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত নারীকে বিশেষভাবে দেখার অনুমতি দিয়েছে, তাতেও ইসলামী শরী‘আতের হিকমত রয়েছে।

পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ নারীর জন্য নয়:

তেমনিভাবে ইসলামী শরী‘আত নারীকে একসাথে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেছে। কারণ, নারীকে এক সাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হলেও মানুষের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় থাকবে না। তাই ধ্বংস হয়ে যাবে পরিবার এবং বিবাহের ফলাফল। এজন্যই ইসলামী শরী‘আত নারীকে একসাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয় নি।

অপর দিকে ইসলামী শরী‘আত পুরুষদেরকে শর্তসাপেক্ষে একসাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের যদি জৈবিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকে এবং একাধিক স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে একাধিক বিয়ে করতে পারে। কারণ, এতে বিবাহের উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের সমস্যা হয় না। সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ মর্যাদা বহাল থাকে। পরিবারও ধ্বংস হয় না বরং একাধিক পরিবার হতে পারে। কিন্তু তার পরেও ইসলামী শরী‘আত পুরুষদেরকে শুধু ফুর্তির জন্য একসাথে একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন দেয়নি। কারণ, এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদি হ্রাস পায়। একে-অন্যে হিংসা বিদ্বেষের মাধ্যমে স্বামী কর্তৃত্বে আঘাত হানে, পরিবার ভেঙ্গে যায়। এমনকি পরিবারের সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অতএব, ইসলামী শরী‘আতের এ সিস্টেমের ভিত্তিতে, দয়া-ভালোবাসা-সহমর্মিতার ওপর

একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে। জাগ্রত হয় একে অন্যের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব। তখন স্বামী তার স্ত্রীকে এমন কোনোও কাজে বাধ্য করতে পারে না বা তার ওপর এমন কোনো কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না, যা তার ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। তেমনিভাবে স্ত্রীও তার স্বামীকে এমন কোনোও কাজে বাধ্য বা তার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না, যা তার ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। আর এতেই রয়েছে পরিবারের শান্তি।

পরিবারিক সমস্যা সমাধানে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ভূমিকা:

যদি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে মেনে নিতে না পারে, তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি, মনোমালিন্যতা ভুল বুঝাবুঝি লেগেই থাকে। তখন তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে অটল থাকতে বাধ্য করা যাবে না, বরং ইসলামী শরী‘আত স্বামীকে তালাক প্রদানের অনুমতি আর স্ত্রীকে খুলা‘-এর মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। কারণ, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে বিবাহ বহাল রাখা তাদের জন্য এবং বিশেষ করে সন্তানের জন্য বিচ্ছেদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক।

এজন্যই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর এ বিষয়াবলিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং স্বামী-স্ত্রীকে তাদের দায়িত্ব, অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সতর্ক ও নসীহত করেছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তাদের নিজ সত্ত্বা ও তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার ও খরচ করার অধিকার দিয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বা অন্য কোনো ধরনের প্রতারণামূলক আশ্রয় না নিয়ে তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও একে অন্যের পরিপূরক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সুখী সুন্দর পরিবার গঠন ও জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যটা হয়েই যায়, তাহলে ইসলাম তাদেরকে সৎ ও সঠিক পন্থায় যে কোনোও মাধ্যমেই হোক মীমাংসার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে বিচ্ছেদের মাধ্যমে একটি পরিবার ধ্বংস না হয় এবং সন্তান সন্ততি বিপদে না পড়ে। কিন্তু তার পরেও যদি তাদের মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা সম্ভব না হয়, তখন ইসলাম স্বামীকে তালাকের মাধ্যমে আর স্ত্রীকে খুলা'-এর মাধ্যমে বিচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে। এতে তাদের উভয়েরই ক্ষতি রয়েছে, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হারাবে এবং আরেকটি সংসার গড়তে অতিরিক্ত বোঝা-সহ নতুন করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আর খুলা'র ক্ষেত্রে স্ত্রী তার প্রাপ্য সম্পদ তথা মোহর হারালো। এ জন্যই ইসলামী শরী'আত খুলা-এর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীকে মোহর হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতেই খুলা' করার নির্দেশ দিয়েছে। এ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সংসার ও তাদের বিচ্ছেদের বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দিক নির্দেশনা।

সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভূমিকা:

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি। মানুষকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবারই তার প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয়। ইসলামী শরী'আত পরিবারের সকল সদস্যের দিক ও প্রয়োজন বিবেচনা করে পরিবারের জন্য কিছু বিধি বিধান ও নিয়ম নীতি দিয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে দয়া-অনুগ্রহ-সহমর্মিতার ভিত্তিতে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে উঠে।

মানুষ যেমন পরিবারের সদস্য তেমনি সমাজেরও সদস্য। মানুষের রয়েছে পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব। এ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের মিশ্রণ এবং বৈপরীত্যও রয়েছে, যা অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি ও সীমালঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পরিবারে

পিতার যেমন একটি অবস্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে মায়ের ও ছেলে-মেয়েদের, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে পারিবারিক আলাদা ও ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব ও ভূমিকা, যা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকার সাথে মিলে না।

অতএব, পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে বাবার সম্পর্ক হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক, সম্মান মর্যাদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক, তেমনিভাবে পরিবারে, মা-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদির সম্পর্ক যা সামাজিক সম্পর্কের সাথে মিলবে না। কারণ, সামাজিকভাবে অনেক সময় বাবার চেয়ে ছেলের অবস্থান মায়ের চেয়ে মেয়ের অবস্থান স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর অবস্থান অনেক উন্নত ও ঊর্ধ্বে হতে পারে তাদের প্রত্যেকের বিবেক বুদ্ধি সামর্থ্য ইত্যাদি অনুযায়ী। তাদের এ সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ও ভূমিকার মিশ্রণ ও বৈপরীত্য কোনোও কোনোও সময় পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি, মনোমালিন্য, অনধিকার চর্চা, সীমালঙ্ঘন ও পারিবারিক দুর্বলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

পুরুষ হচ্ছে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের ছেলে-মেয়ের বংশ পরিচয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীকে পরিচালনা করা, তাদের যথাযথ শান্তি নিরাপত্তা, উন্নতি অগ্রগতি ইত্যাদি নিশ্চিত করা, এমনকি পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে স্বামী। কারণ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি তাদের নিরাপত্তা, শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে পরিবারের পুরুষ বা স্বামীর ওপর। আর এসব কিছুর ওপর নির্ভর করে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে গঠন করতে হলে পরিবারকে গঠন করতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, সাধারণত পুরুষ এবং মহিলা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোক।

পুরুষ হচ্ছে একক স্বভাবের লোক আর নারী হচ্ছে দ্বৈত স্বভাবের লোক। পুরুষের রয়েছে শুধুমাত্র কাজের ক্ষমতা। আর নারীর রয়েছে কাজ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী সন্তান প্রসব এবং তার লালন পালনের অর্থাৎ মাতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েই জীবন-যাপন করে। সন্তান প্রসবে এবং আদর-যত্ন, লালন-পালনে নারী ও মাতৃত্বের বিকল্প নেই। এজন্যই একটি সন্তানকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হলে, নারী ও মাতৃত্বকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তাই একজন মা বা নারীকেও তার আত্মিক, মানসিক, বৈষয়িক সবকিছু উজাড় করে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। এজন্যই নারীকে পুরুষের থেকে আলাদা করা যাবে না। নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করা বা দূরে রাখার মানেই হচ্ছে নারীর ওপর এবং সন্তান সন্ততির ওপর মানসিক ও বৈষয়িক-ভাবে যুলুম করা। সুতরাং নারীকে পুরুষেরই কর্তৃত্বাধীন ও ছত্র-ছায়ায় রাখতে হবে।

অপর দিকে পুরুষ হচ্ছে শুধুমাত্র কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন একক স্বভাবের অধিকারী। পুরুষের মধ্যে সন্তান গর্ভধারণের ক্ষমতা নেই। এজন্য পুরুষকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যোগ্যতা-সম্পন্ন ও শক্তিশালী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী তার যথাযথ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে তা'লীম-তরবিয়তের আদর যত্ন ও লালন পালনের মাধ্যমে একটি সন্তানকে তার প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারই মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বামীকে বা পুরুষকে সহযোগিতা করতে হবে। এটিই হচ্ছে একটি পরিবারের আসল ও মূল কথা এবং স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের মৌলিক দায়িত্ব।

পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা:

এ জন্যই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভূমিকার

মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য, নিজের প্রাধান্য সৃষ্টি করার কোনোও অবকাশ নেই, প্রত্যেকের একটি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা রয়েছে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে গণ্য। তাই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে একজন নারীর প্রথম দায়িত্ব ও ভূমিকা মা ও মাতৃত্বের ভূমিকা পালন, যা পরিবার ও সমাজের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ একজন নারী মা হিসেবেই তার সন্তান সন্ততিকে হাজার কষ্টের পরও সারা রাতের আরামের ঘুম হারাম করে সর্বাধিক আদর সোহাগ আর স্নেহ মমতার ভিতর দিয়ে লালন-পালন করেন, যা একজন পুরুষ কখনও করতে পারে না। এটিই হচ্ছে একজন নারী ও পরিবারের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী শরী'আত সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সুতরাং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিরোধিতা সমাজের যে কেউ করুক না কেন সে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক ফিতরাত/স্বভাব থেকে দূরে সরে যাবে এবং ইসলামী শরী'আতের বিরোধিতা করবে। এটা সে পাশ্চাত্য প্ররোচনায় করুক আর ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণেই করুক, সমান কথা। যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্ররোচনায় আজ নারী সমাজকে দেহ-ব্যবসা আর যৌনাচারে লিপ্ত করে তাদের ভোগের পাত্র আর খেলনার উপকরণে পরিণত করেছে। তেমনিভাবে কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণ আর অন্ধ বিশ্বাসের কারণে নারীদেরকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা, যথাযথভাবে সন্তান লালন-পালন, স্বামীর সেবা ও তাকে সহযোগিতা এবং জাতি ও সমাজের সেবামূলক শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞতা, মূর্খতা, সংকীর্ণতার বন্দিশালায় আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় এবং নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, প্রযুক্তিগত উপকরণ

তৈরি করা হয়েছে যাতে সে নিজেকে পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও সমাজ সেবার জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারে।

নারীদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা:

বর্তমান মুসলিম সমাজে নারীদের প্রতি খুবই কঠোরতা করা হয়ে থাকে। এমনকি শরী'আত অনুমতি দিয়েছে এমন কোনো অনুষ্ঠানেও তাদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। যার কারণে তারা অনেকাংশে জ্ঞান অর্জন ও বিভিন্ন শিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মুসলিম নারীদেরকে তুলনামূলক-ভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। এমনকি হিন্দু নারীদের থেকেও মুসলিম নারীদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে। অথচ ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে হিন্দু ধর্মে তার কিঞ্চিতও দেয় নি, তারপরেও হিন্দু নারীরা সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অথচ একজন মুসলিম নারীকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। যার ফলে মুসলিম সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়ত ও সুশিক্ষা এবং ইসলামের সামাজিক কর্মকাণ্ডে দুর্বলতা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল-গাযালী রহ.-এর গ্রাম্য ও বাল্য জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি কীভাবে গ্রামের সর্বস্তরে নারীদেরকে দেখতে পান, কিন্তু দেখতে পান না একমাত্র মসজিদে। সে প্রসঙ্গেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

'আমার অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যখন আমি দেখি যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহে মুসলিমদের মসজিদগুলোতে নারীদের জন্য সালাতের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। আর কোনো মতে ব্যবস্থা থাকলেও তা পর্দার আড়ালে পিছনের কাতারে এমনভাবে ব্যবস্থা করা যে, একজন মহিলার

এ অবস্থায় সেখানে সালাত পড়াটাও কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অথচ তারা মসজিদে সালাতে গেলে অধিক পর্দা অবলম্বন ও অত্যন্ত আদরের সাথে যায়। এমনকি মসজিদে অন্যান্য সকল মুসল্লীও পাক-সাফ হয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে মসজিদে সালাত পড়তে যায়। তারপরেও কোনো জিনিসটি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করে? বা মসজিদে উপস্থিত হলেও কোনো বিষয়টি নারীদেরকে সর্বশেষ কাতারে পর্দার আড়ালে সংকুচিত স্থানে সালাত আদায় করতে বলে? অথচ মুসলিমদের ইবাদতের স্থান মসজিদ থেকে বের হলেই হাট বাজার রাস্তা ঘাটে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্দ্বিধায় সব ধরনের কাজ করছে!! সেখানে কি তাদের মানসিক কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় না? আসে না তাদের মনে কোনো ধরনের কুমন্ত্রণা? আসে শুধু পাক-পবিত্র স্থান মসজিদে আল্লাহর ইবাদতের কাজে!!

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলিমদের মসজিদসমূহে জুমার সালাত ও তার খুৎবায় পর্যন্ত মুসলিম নারীদের উপস্থিত হতে দেখা যায় না এবং তাদের জন্য মসজিদে উপস্থিত হবার বা সালাতের কোনো ব্যবস্থাও করা হয় না। এতে মনে হয়, যেন আল্লাহর নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এসেছে, নারীদের বেলায় কিছুই আসে নি, ইসলাম নারীদেরকে সামাজিক অধিকার দেয় নি। সামাজিক দায়-দায়িত্ব বলতে নারীদের কোনো ধরনের ভূমিকাই নেই এবং নারীদের সামাজিক কোনো মর্যাদাই নেই। প্রকৃত পক্ষে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে এ সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে নারীদের বেলায় ইসলামিক নির্দেশের ভুল বুঝাবুঝি, অর্থাৎ ইসলাম নারীদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব, সন্তান লালন-পালন, দেখা-শোনায়, স্তন্যদানে ও মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনে জুমা ও জামা'আতে উপস্থিত না হবার অনুমতি

প্রদান করেছিল। যাতে একজন মায়ের জামা‘আতে বা জুমু‘আর সালাতে উপস্থিতির কারণে তার দুধের শিশু চটপট ও কষ্ট না করে। বিশেষ করে রাতের সালাত এশা ও ফজরের সালাতে নারীদের মসজিদে জামা‘আতে উপস্থিত না হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে। যাতে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে কোনো সমস্যা না হয়। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব এবং সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি কারণ ছাড়া নারীদেরকে মসজিদে সালাতের জামা‘আতে উপস্থিত হতে এবং জুমু‘আর সালাত ও খুৎবাতে উপস্থিত হতে নিষেধ ও বাধা প্রদান করে নি। কারণ, পুরষ যেমন সমাজের অংশ, নারীও তেমন সমাজের অংশ; পুরুষের যেমন ধর্মীয় দায়িত্ব পালন আবশ্যকীয়, নারীরও তেমন আবশ্যকীয়। এতে ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষ উভয়েরই মধ্যে কোনো পার্থক্য ও প্রাধান্যের কোনো কারণ নেই। কিন্তু ইসলামের সেই নির্দেশকে ভুল বুঝার কারণে নারীদেরকে মসজিদ, জামা‘আত, জুমু‘আ, খুৎবা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা হচ্ছে ও নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ ইসলামের নির্দেশ ছিল তাদের প্রতি সহনশীলতার জন্য। ইসলাম কখনো তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে নি। রাসূলের বাণী «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ» “তোমরা নারীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা প্রদান কর না[6]।”

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা:

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ তথা

[6] আহমদ, হাদীস নং ৫০৪৫।

ইসলামী শরী'আত এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরী'আত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোনো বাছ-বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরী'আত ও তাদের শরী'আতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলিম ও ইসলামী শরী'আত বাদ দিয়ে কোনো সময় এমন কোনো কাজ সমর্থন করতে পারে না, যে কাজে পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন বা বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা নারীর ইজ্জত সম্মানে আঘাত হানে অথবা নারীর মাতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা বিপদকে টেনে আনে।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মতো করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেখা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীদের ইজ্জত সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের পণ্য হিসেবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে নেই কোনো সামাজিক বন্ধন এবং নেই কোনো স্নেহ মমতা। পশ্চিমা নারীরা যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন তাদের আর কোনো মূল্যায়ন থাকে না। তারা তখন ঘৃণা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রার্থক্য:

সমাজে নারী এবং পুরুষ এক নয় এবং এক হতেও পারে না। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বভাব, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন। নারী-পুরুষ সমাজের একে অন্যের পরিপূরক। তেমনিভাবে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এক নয়। এক মনে করাও ঠিক নয়। বরং উভয়ের

জন্য ক্ষতিকর। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, পরিবারের, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-সন্তান ও অন্য সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আর নারী বা মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, সন্তান লালন-পালন ও যথাযথ শান্তি, নিরাপত্তা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। অতএব, নারী পুরুষের দায়িত্ব এক মনে করার মানেই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

মুসলিম সমাজে একজন নারীর প্রদান দায়িত্ব:

এ জন্য ইসলামী শরী'আত ও মুসলিম সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে উত্তম পন্থায় নারী ও পুরুষের শক্তি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের খেদমত করা যায়।

এর কারণেই মা ও মাতৃত্ব এবং পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং দিতে হবে। তাদেরকে সকল বিচ্ছেদ, ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও প্রভাবমুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মা ও পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন।

এ জন্যই আমাদের উচিৎ এবং কর্তব্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের অংশীদার হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান ও উপার্জনের যথাযথ ব্যবস্থা করা। যাতে সঠিকভাবে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যায়।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী নারী পুরুষ এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সহজ এবং সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। নারীর বেলায় মা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন ও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন হিসেবে মনে করা হয়। তাদের সে দায়িত্ব পালনের যথার্থ ব্যবস্থা করা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নারী তার মাতৃত্ব-সুলভ দায়িত্ব পালনে এবং সন্তান-সন্ততির যথাযথ লালন পালন, আরাম-আয়েশ এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তার ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, মাতৃত্বের সংরক্ষণ ও হিফাযত করার জন্য মানসিক-আত্মিক ও বৈষয়িকভাবে সমাজের ও পুরুষের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

অতএব, আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং সামাজিক সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থান তৈরির বেলায় এদিকগুলো বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা ও কর্ম সংস্থান:

আদর্শ জাতি গঠনে নারীদের অবদানকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। নারীদেরকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আদর্শ ও সমৃদ্ধ জাতি সহায়তা নেয় আবশ্যক। কারণ, নারীরা জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলিম সমাজে নারীদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি, প্লে-গ্রুপ এবং ইবতেদায়ী ও প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, একজন নারী স্বভাবগতভাবে বাচ্চা ও শিশুদের পাঠদানে অধিক উপযুক্ত ও অধিক সামর্থবান। এ কাজ নারীদেরকে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানও করে না। এজন্য অনেক

নারীই নিজেকে তাদের কাজের কিছু সময় বা অর্ধেক সময় স্বল্প মজুরীতে/বেতনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা নারীদেরকে তাদের কাজে ও দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং নারীদের মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে। এমনকি সমাজে এমন কিছু নারী রয়েছে, যারা পারিবারিক ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের জন্য এমন পেশা আরও অধিক উপযোগী। কিন্তু তারপরও কোনো মুসলিম বিশ্ব তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে না। তারা এ শিক্ষকতার পেশাকে শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে রুটিন অনুযায়ী ভাগাভাগি করে খুব সহজেই কাজে লাগাতে পারতো। এমনকি এ ধরনের অন্যান্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মস্থল রয়েছে, যেগুলো সিস্টেম অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারত।

সাধারণত ২০ (বিশ) বছর বয়সেই একজন নারী তার শিক্ষা জীবনের অনার্স, মাস্টার্স, বা ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করতে সক্ষম হয় বা শেষের পর্যায়ে চলে যায়। তেমিনভাবে এই বয়সেই একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে এবং সুস্থ সবল সন্তান ভূমিষ্ঠ ও তার যথাযথ লালন-পালনের ব্যবস্থা গ্রহণে শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়ে থাকে।

এজন্য নারীদেরকে এ বয়স থেকে অন্তত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিৎ ও কর্তব্য, যাতে অন্তত তাদের শেষ সন্তানটি পর্যন্ত মায়ের লালন-পালন আদর যত্ন ও তা'লীম-তরবিয়তের ভেতর দিয়ে আত্মিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

এরপর যখন একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে তা'লীম-তরবিয়ত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মমতাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলবে। তখন তাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করতে হবে। তখন থেকে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিৎ। কারণ, নারীদের সাধারণত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী হরমোনজনিত কারণে স্বভাবগতভাবে নারীর মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যায়। নারী তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন হরমোন-জনিত কারণে পুরুষের তুলনায় নারী অধিক সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। তেমনিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর আয়ুষ্কাল বা বয়স পুরুষের তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। এজন্য নারীকে ৬৫-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত সামাজিক কাজে বা পেশাগত কাজে নিয়োজিত রাখা উচিৎ।

কিন্তু আমরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আলোকে নারীদেরকে তাদের ফুটন্ত যৌবনে মাতৃত্বের ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে নিয়ে আসি। আবার যখন মাতৃত্বের বয়স শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের সামাজিক আর্থিক দায়িত্ব পালনের দরজা বন্ধ করে দেই অর্থাৎ তাদের অবসর জীবনে চলে যেতে হয়। এভাবে পশ্চিমাদের অনুসরণে আমরা নারীদের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে মাতৃত্বের অপমান করছি।

অথচ আমাদের অবশ্যই উচিৎ ও কর্তব্য ছিল যে, নারীদের জন্য তাদের সঠিক বয়সে সম্পূর্ণ আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারণ, এতে একদিকে যেমন নারীদের জন্য আলাদা কর্মস্থল ও কাজের সেক্টর এবং ব্যবস্থা করাও সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি নারীরা ছলে-বলে হোক আর

কৌশলে হোক অথবা জোরপূর্বক হোক কোনো পরপুরুষের কাছে দুর্বলতার শিকার হয়ে মাথা নত না করে নিজেরাই আত্মিক, মানসিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও ভারসাম্য রক্ষা করে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারে। যদি নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা না করে যৌথ কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে হয়তো জৈবিক দুর্বলতার কারণে না হয় বস বা মালিককে খুশি করার কারণে অথবা নিজের ক্যারিয়ার গঠন ও পদোন্নতিসহ নানা কারণে জৈবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। ভেঙ্গে যাবে পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন। যার বাস্তব চিত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কারণ, স্বভাবগতভাবে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দুর্বল। তারপর একই স্থলে দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যস্ততায় আরও দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এটিই হচ্ছে আমাদের ইসলামী শরী'আত ও পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণে এমনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন শুরু করার আগেই শেষ না হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রোডাকশন বা ফলাফল লাভ করা পর্যন্ত উৎপাদনের সকল উপকরণ যথাযথ ব্যবহারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক বিষয়টি একেবারে সহজ বিষয় নয়, বরং এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে।

তেমনিভাবে আমাদেরকে নারী ও পরিবার কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। যাতে সঠিকভাবে ফলাফল লাভের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারি।

তেমিনভাবে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামী শরী'আতের আলোকে নারীদের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা তাদের মাতৃত্বমূলক দায়িত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির লক্ষে নারীদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও সমাজের অংশ সে মনোভাব অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

আদর্শ জাতি গঠনে পরিবারের ভূমিকা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, স্থপতি, সংস্কারকগণ শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত, ও তার কারিকুলাম উন্নয়ন এবং শিশু বিষয়ক সংস্কৃতির সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন নি, বরং তারা গুরুত্ব দিয়েছে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে, যার ফলে জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে আমাদের আলো নির্বাপিত হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে আশা আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা। জাতি পরিণত হয়েছে একটি প্রাণহীন দেহতে। অথচ উচিৎ ছিল বাল্য বয়সেই একটি শিশুর ভিতরে সে সকল মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা।

সুতরাং এ নিষ্প্রাণ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত-পরিচর্যা এবং নারী ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি আজ সর্বস্তরে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং উপনিবেশ ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে ধাঁধা লাগানো অত্যাধুনিক নানা আবিষ্কারে আর বিজ্ঞাপনে দিশেহারা, সে জাতি কীভাবে তাদের

শিশুর সেই হারানো অদৃশ্য শক্তিকে ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্ম থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবে। এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটিই। তা হচ্ছে, পারিবারিক ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক ভূমিকার মাধ্যমে সঠিকভাবে শিশুর লালন-পালন ও তার পরিচর্যা করে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে জাতি এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে।

প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ:

প্রকৃত পক্ষে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র। তারই হাতে রয়েছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শক্তি বৃদ্ধির চাবিকাঠি। তারাই জাতিকে সঠিক সংস্কার ও পরিশোধনের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং ইলমে অহীর দিক নির্দেশনার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারে। তবে তাদের এ সংস্কার এবং তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংগঠন আর প্রতিষ্ঠান-নির্ভর হলে চলবে না। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কার ও পরিশোধন করতে পারবে না। কারণ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজেদের উপকার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আধুনিক বিশ্বের অনুকরণ করে থাকে। তাদের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো কিছু করতে তারা রাজি হয় না। তারা জাতির অনুসরণ করে মাত্র। তবে তার মানে এ নয় যে, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। বরং সংস্কার-পরিশোধন ও তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে গৌণ ভূমিকায় রাখতে হবে। বর্তমান প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলো তাই প্রমাণ করে। সেখানে রয়েছে বিশেষ ধরনের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তা'লীম-তরবিয়ত। তারা কোনো সময়ই ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইসলামী তা'লীম-তরবিয়তের বেলায় উৎসাহ প্রদান করে না। তবে তার মানে এ নয় যে, প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলোকে পরিত্যাগ করব; বরং আধুনিক প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক এবং চিন্তাবিদদের জন্য সংস্কার পরিশোধন এবং তা'লীম-তরবিয়তের বিরাট একটি

উপকরণ হতে পারে। যার মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারে।

এর মাধ্যমে যদিও সকল সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই ধারাবাহিকতায় বা ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তদুপরি সার্বিকভাবে তাদের সামনে একটি দিক নির্দেশনা তুলে ধরতে পারবে। যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন মূসা আলাইহিস সালাম ও তার ভাই হারুন আলাইহিস সালাম আরব জাতিকে।

যদিও আমাদের পক্ষে বর্তমান আধুনিক প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও অত্যাধুনিক যন্ত্র সরঞ্জামাদির যুগকে মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের যুগের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়; তদুপরি আমাদেরকে তথা মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ইসলামী তা'লীম-তরবিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা সভ্যতা, সংস্কৃতি, তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষাসহ প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি দিকের মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন করতে হবে। গোটা সমাজ তথা পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ সকল প্রকার আগ্রাসনের মোকাবেলা করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন করে গোটা সমাজ ও পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন এমন প্রজন্মের, যাদেরকে তাদের আত্মাই তাদের কাজ কর্মে প্রেরণা প্রদান করবে। তাদের স্বভাবই (فطرة) সংস্কার ও পরিশোধনের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারাই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করবে। তারাই তাদের সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম উম্মাহ

ও জাতির জাগরণের কাজ চালিয়ে যাবে। সমকালীন সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করবে।

সামাজিক পরিবর্তনে পিতার ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মুক্তি-পরিত্রাণ লাভ এবং সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন প্রতিটি মুসলিমের প্রাণের দাবি। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এ প্রাণের দাবি আদায়ের জন্য প্রথমেই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর ওপর একান্ত ভরসা করতে হবে। তারপর সকল প্রকার নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। এ আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তি অর্জিত হবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পারিবারিক জীবনে একটি মুসলিম মানব সন্তানকে আত্মিক ও মানসিকভাবে গঠন করার মাধ্যমে। আর এ কাজটি করতে পারে শিশুর পিতা কর্তৃক অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে। কারণ, একজন পিতা সর্বাবস্থায় তার সন্তান ও শিশুদের তরবিয়ত ও শাসন ইত্যাদি তাদের কল্যাণের জন্যই করে থাকে। এজন্য শিশুদের পিতার অনুপ্রেরণা প্রদানই মুসলিম উম্মাহর সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে থাকে।

যেহেতু একজন পিতা সার্বক্ষণিকভাবে তার সন্তানদের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকেন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তারাই শিশুদের অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন। বর্তমান যুগে ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণ, তা‘লীম-তরবিয়ত এবং ইসলামী সংস্কার-পরিশোধনের একমাত্র চাবিকাঠি তাদের হাতেই বলতে হয়। তবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সামাজিক পরিবর্তন ও পরিশোধনের জন্য সন্তান ও শিশুদের গঠনের ক্ষেত্রে জাতির চিন্তাবিদ গবেষক, পরিশোধক ও সংস্কৃতিবিদদেরকে

সহায়তা করতে হবে। তাদেরকে শিশুদের কল্যাণের বিষয়াবলীর প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তাদেরকে শিশুদের আত্মিক ও মানসিক গঠনের পথ ও পন্থা ইসলামের মূল্যবোধ ও মূলনীতির আলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে সকলেই ইহ কালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। এজন্য জাতির চিন্তাবিদ, গবেষক ও সংস্কৃতিবিদদের জাতির সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে।

এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির খেদমতে এবং জাতির নতুন প্রজন্মকে শক্তিশালী ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে মাদরাসা ও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা শিশুদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের জন্য বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করতে পারে, যে সেমিনারের মাধ্যমে তারা বাবা-মা ও অভিভাবকদের সামনে সঠিক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিশুদের সঠিক তা'লীম-তরবিয়তের মৌলিক পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরতে পারে।

তেমনিভাবে এ কাজে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও অংশ নিতে পারে। তারা যুবকদের জন্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং ইসলামিক বিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিবার গঠনের পদ্ধতি ও নিয়মাবলি ইত্যাদি শিক্ষা দিতে পারে, যাতে ঐ যুবকরা সঠিক পদ্ধতিতে দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে ইসলামিক মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করতে পারে।

বিশেষভাবে ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। তারা জাতির সংকট নিরসনে এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য শিশুদের

অভিভাবক বাবা-মাদের জন্য সেমিনার, সভা, আলোচনা পর্যালোচনা-সহ নানা রকম ব্যবস্থা নিতে পারে, তাদের সতর্ক ও সচেতন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এমন একটি জাতি উপহার দিতে পারে, যারা মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন এবং সংস্কার সাধন করতে সক্ষম। কারণ, বাবা, মা ও অভিভাবকরাই হচ্ছে শিশু গঠনের প্রাথমিক মাদরাসা ও শিক্ষালয়। তাদের মাধ্যমেই সঠিক জাতি গঠন সম্ভব হবে।

তালিম-তারবিয়াতে বাবা-মায়ের ভূমিকা:

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে স্কুল, মাদরাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করার বিষয়টি নির্ভর করে পারিবারিক শিক্ষা বা বাবা-মা ও অভিভাবকদের শিক্ষার ওপর। স্কুল, মাদরাসা, মক্তব তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একজন অভিভাবক, বাবা-মা তার সন্তান তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করতে অধিক সক্ষম। কারণ, বাবা-মা ও অভিভাবক তার একটি সন্তানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সার্বিক দিক খুব ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারে। অনেকেই ইতিবাচক বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের সে সমস্ত দিকগুলো বিবেচনা করা সহজসাধ্য না হওয়ার কারণে তারা লাগামহীনভাবে তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করতে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা ধরনের সমস্যাও থাকতে পারে। এজন্য প্রত্যাশিত তা'লীম-তরবিয়তের বেলায় বাবা-মা এবং অভিভাবকদের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একটি আদর্শ পরিবারের হাতেই রয়েছে শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের সর্বাধিক ক্ষমতা ও শক্তি। এজন্য শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে পরিবারকে শিশুদের চোখে আয়না বা রঙ্গিন চশমার সাথে তুলনা করা

হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চোখে লাগালে, প্রকৃতির দৃশ্যও রঙ্গিন দেখায় তেমনিভাবে পরিবার তার সন্তানকে যা বুঝাবে, যা শিক্ষা দিবে, তাই বুঝবে ও শিখবে। শিশু কি দেখল অথবা কি শুনল সেটি বড় কথা নয়, বরং শিশুদের ক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে শিশুদের কি বুঝানো হচ্ছে। এজন্য দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠানের একই সিলেবাস একই শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্র ও শিশুগুলো ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। অথচ কথা ছিল একই প্রকৃতি একই স্বভাবের হওয়ার। কিন্তু তারপরও ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হওয়ার কারণ হচ্ছে পারিবারিক প্রভাব এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী পরিবেশের প্রভাব। এজন্য শিশুদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাবা-মা ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে তা'লীম-তরবিয়তের অভাব:

বর্তমানে আমরা যদি মুসলিম উম্মাহ ও জাতির তা'লীম-তরবিয়তের গুরুত্বের প্রতি অবলোকন করি, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে প্রচার মাধ্যমকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর তৃতীয় স্তরে রাখতে হবে পারিবারিক গুরুত্বকে। কারণ, বর্তমান সমাজে পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র শিশুদের আহার-বিহার পরিধান, ও বাসস্থানের আর চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পারিবারিক তা'লীম-তরবিয়তের গুরুত্ব নেই।

তেমনিভাবে আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার-মিডিয়া এবং পারিবারিক ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র কিছু ওয়াজ নসিহত, উপদেশ আর

বাণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত বা স্বভাবের প্রতি কোনোও লক্ষ্য নেই। তারা জানেই না কীভাবে তাদের আত্মিক এবং মানসিক বিকাশ সাধন করতে হয়। কীভাবে তাদের তা'লীম-তরবিয়ত এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। কীভাবে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি আর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাদের কোনো লক্ষ্য নেই।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, আজ পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের ওপর উপনিবেশ সৃষ্টি করছে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে আগ্রাসন চালাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি হ্রাস পাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহ জাতির ওপর মহামারীর আকার ধারণ করছে। এখন জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্থ নিয়েই ব্যস্ত। পার্থিব সম্পদ, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি আর অহমিকা নিয়েই জীবন-যাপন করছে। সাধারণ সমাজে আজ হিংসা, বিদ্বেষ, যুলুম, নির্যাতন, অন্যায় অবিচার, আর দুর্নীতি বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। সামাজিক নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, সামাজিক কল্যাণ, জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা, ইসলাম ও মানবতার মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফ, আদালত ইত্যাদি বিষয়ের আজ কোনো গুরুত্ব নেই। এমন কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠন পাওয়া যায় না, যারা এ সকল বিষয়ে সাধারণ সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে সচেতন করে তুলবে। তাদের শক্তি সামর্থ্য আর মনোবল দিয়ে এ কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে এবং অন্যায়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিবে।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদরাসা এবং প্রচার মাধ্যমগুলো এ বিষয়ে তাদের আশানুরূপ দায়িত্ব আদায় করছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা একই ধরনের। এ সকল বিষয়ে তাদেরও ভূমিকা একেবারে নগণ্য। তারাও মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জন্য যোগ্য শিক্ষক এবং মেধাবী নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারছে না, তাদের জন্য সভা, সেমিনার-আলোচনা, পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে পারছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিশুদের উন্নয়নে এবং তাদের মধ্যে লুকায়িত আত্মিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারছে না। জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য তাদের কাজে স্পৃহা জাগাতে পারছে না।

আমরা যদি শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত আর শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় মুসলিম বিশ্বকে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী এবং সাধারণ বিশ্বের মাঝে তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মুসলিম বিশ্বের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান-অনুদান অত্যন্ত নগণ্য। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল এবং সামাজিক তা'লীম-তরবিয়তী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ জনগণের সাহায্য সহায়তায় অথবা গরীব-দিনমজুর অভিভাবকদের অনুদানে পরিচালিত হয়। যার কারণে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-ব্যবস্থা, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের মান-মর্যাদার অবনতি ঘটেছে। তাদের অগ্রগতি উন্নতির মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

তেমনিভাবে আমরা যদি মুসলিম বিশ্বের শিক্ষার কারিকুলাম এবং উপকরণাদির প্রতি তাকাই, তাহলে একই অবস্থা দেখতে পাবো। সেখানে পাবো দীর্ঘকাল যাবত দুর্বল, রুগ্ন ও ব্যর্থ শিক্ষা-কারিকুলাম ও সিলেবাস এবং শিক্ষার উপকরণ, যার কারণে শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশ হচ্ছে না। তাদের মধ্যে জাগরণের স্পৃহা আসছে না, বরং তাদের মধ্যে যুলুম, সন্ত্রাস, অসহায়তা আর হতাশা বিরাজ করছে। এজন্য মুসলিম বিশ্বকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষায় দুর্বার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে মুসলিম বিশ্ব তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।

তেমনিভাবে আমরা যদি আমাদের পুর্বপুরুষদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, তাদের একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের সভ্যতা- সংস্কৃতি, অপর দিকে ছিল না তাদের তা'লীম-তরবিয়তের আদব-শিষ্টাচারের অগ্রগতি-উন্নতি। অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে যুলুম-নির্যাতন, সন্ত্রাস আর শারীরিক নির্যাতনের অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের তা'লীম-তরবিয়তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একইভাবে তাদের অজ্ঞতা আর মূর্খতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাদের পরিবার-ব্যবস্থা, যার কারণে তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা গবেষণা হ্রাস পেয়েছে। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, তা'লীম-তরবিয়তের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক এবং জৈবিক বিকাশ কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এজন্য আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তা'লীম-তরবিয়ত আর সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্জের

মোকাবেলা করে আবারও আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারি।

তরবিয়তী পরিবারের শিষ্টাচারের গুরুত্ব:

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তরবিয়তী পরিবারের আদব-শিষ্টাচার ও আচার ব্যবহার। কারণ, মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন এবং জাগরণ সৃষ্টিকরণ পারিবারিক আদব-শিষ্টাচারের মধ্যেই নিহিত। এজন্য বেশ কয়েকটি কারণে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কৃতজ্ঞ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদেরকে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পারিবারিক আদব-শিষ্টাচারকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

প্রথমত: পারিবারিক তত্ত্বাবধান:

শিশুর জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসহ আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠন ও উন্নয়ন সাধনে পারিবারিক ভূমিকা অনন্য। কারণ, একমাত্র ঘর বা পরিবারই হচ্ছে শিশুর উৎসস্থল, আরাম-আয়েশ, আশ্রয় ও বিনোদন, পারিবারিক ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক-নির্দেশনা, আচার ব্যবহার আর আদব-শিষ্টাচারের মধ্য দিয়েই একটি শিশুর বিবেক বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। এজন্য শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারকে রঙ্গিন চশমার সাথে তুলনা করা হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চোখে লাগালে প্রকৃতির দৃশ্য ও রঙ্গিন দেখায় বা চশমার রং ধারণ করে; তেমনিভাবেই একটি শিশু তার পরিবারকে এমনি অনুসরণ করে। শিশুরা কী দেখল, কী শুনল? সেটি বড় বিষয় নয়, বরং পরিবার শিশুদেরকে কী বুঝালো, শিশু কী অনুধাবন করল? সেটি হচ্ছে বড় বিষয়। তাই পরিবার যেমন হয়ে থাকে শিশুর আত্মিক মানসিক তথা জ্ঞান অনুভূতিও সে রকম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত: পিতা-মাতার ভূমিকা:

পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং পরিবার সার্বক্ষণিকভাবে তাদের সন্তান ও শিশুদের ফিতরাত ও স্বভাব অনুযায়ী তাদের কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তাদের জীবনের মান-উন্নয়ন এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলা-সহ আরাম-আয়েশে ও সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকেন। এজন্য একটি শিশুর ওপর তার পরিবার, বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে। তাই শিশু শিক্ষা, তা'লীম- তরবিয়ত, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাবা-মা, অভিভাবক তথা পরিবারের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত:

একজন সমাজ সংস্কারক পরিশোধক লেখক গবেষক ও চিন্তাবিদ মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বাবা-মা, ও অভিভাবকদেরকে শিশু-পরিচর্যার বিষয়াবলী, শিক্ষা-দীক্ষা, তা'লীম-তরবিয়ত ইত্যাদি হাতে নাতে শিক্ষা দিতে পারেন। তাদের সন্তানদের জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলো সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এ কাজটি সহজে করতে পারে না। তারা যথাযথভাবে বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে উন্মুক্ত বক্তব্য ও সম্বোধন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ সব সময়ই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং সার্বক্ষণিক কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা প্রয়োজনের আলোকে জাতির অনুসরণে সামাজিক পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কার সাধনে সাড়া দিয়ে থাকে।

এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, চিন্তাবিদ, পরিশোধক ও গবেষকদেরকে পরিবার এবং শিশুদের জন্য পারিবারিক

তা'লীম-তরবিয়ত শিক্ষা দীক্ষার বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে বাবা-মা ও অভিভাবকদের জন্য তা'লীম-তরবিয়ত সংক্রান্ত আদব-শিষ্টাচার, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; যাতে তারা সঠিকভাবে যোগ্য ও উপযুক্ত বাবা-মা হিসেবে সন্তানদের তারবিয়তে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা নানা ধরনের অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিকভাবে তাদের সন্তানদের ও শিশুদের আত্মিক-মানসিক, জৈবিক এবং শারীরিকসহ সার্বিক বিষয়াবলী বিবেচনা করে তাদেরকে আদব-শিষ্টাচার, তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি প্রদান করতে সক্ষম হতে পারে এবং তাদের সন্তানদের ইসলামের মূল্যবোধ অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই বাবা-মা পরিবার এবং অভিভাবকদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, তারাই হচ্ছে যুগ ও জাতির পরিশোধনের শুভ-যাত্রা। তাই ইসলামী সংস্কৃতি-বিদ, সমাজ সেবক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদেরকে সাধ্যানুযায়ী তাদের বিদ্যা বুদ্ধি, যোগ্যতা অভিজ্ঞতার আলোকে বিশুদ্ধ নিয়ত ও এখলাছের সাথে বাবা-মা ও অভিভাবকদের জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কারণ, সন্তানদের ওপর তাদের বাবা-মা ও অভিভাবক এবং পরিবারের ভূমিকাই সরাসরি বিনা বাধায় সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারাই তাদের সন্তানদের সার্বিক দিক বিবেচনা করে, আচার-আচরণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে পারে। সন্তানেরাও সহজে তাদের বাবা-মা অভিভাবক এবং পরিবারের আচার-আচরণ, বক্তব্য, আদব-শিষ্টাচার ও উপদেশাবলি মান্য করতে ও বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক ভুরি ভুরি নজির, বাস্তব উদাহরণ রয়েছে।

একজন বাবা-মা বা অভিভাবক এবং পরিবার যদি সঠিকভাবে তাদের সন্তানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খুব সহজেই তাদের সন্তানদেরকে তা'লীম-তরবিয়তের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। শিশুদের তারবিয়াতী শিক্ষা, আদব-শিষ্টাচার ও পরিশোধন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যদি সঠিকভাবে গড়ে ওঠে তাহলে তার প্রভাব যেমন সন্তানদের ওপর পড়ে, তেমিনভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে, তাহলে তার প্রভাবও সন্তানদের ওপর পড়ে, সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদির বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

এজন্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন এবং পারিবারিক জীবনে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি অবশ্যই থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি পরিবারে এ গুণগুলো প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবারে আরাম-আয়েশ, শান্তি বিরাজ করতে পারবে না। সে পরিবার তাদের সন্তান সন্ততিদের তা'লীম-তরবিয়ত, আদব-শিষ্টাচার, আত্মিক ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে না। শিশুরা সার্বিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না।

অতএব, শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক, পারিবারিক ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা দয়া অনুগ্রহ এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি পূর্বশর্ত। বাবা-মায়ের বা পরিবারের সুসম্পর্ক ভালোবাসা ইত্যাদি শিশুদের হৃদয়ে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, শান্তি, নিরাপত্তার ও আনুগত্যের প্রবণতার জন্ম দেয়। শিশুরা সর্বাবস্থায় তাদের বাবা-মা ও পরিবারের ডাকে সাড়া দেয়, তারা তাদের অনুগত স্বীকার

করে, তাদের কল্যাণকর বিষয়গুলো বাস্তবায়নে চেষ্টা করে। বাবা-মায়ের সঠিক ভালোবাসা আর স্নেহ মমতার মাধ্যমে শিশুদের অন্তর থেকে অহেতুক ভয়-ভীতি আর নেতিবাচক প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে আত্মিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে।

প্রকৃত প্রেমিক, আগ্রহী, সচেতন ও বিশ্বস্ত সেই ব্যক্তি, যে সঠিক কল্যাণের পথে নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দিতে পারে, বিপদে সংকটে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। দুঃখ কষ্ট ইত্যাদিতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারে। আর অপারগ, দুর্বল, কাপুরুষ ঐ ব্যক্তি, যে প্রয়োজনের সময় তার শক্তি-সমর্থ ব্যয় করতে পারে না। দুঃখ কষ্ট আর আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। আর এ বিষয়টিই আমাদের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে সর্বস্তরে বিরাজ করছে। যেখানে ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা তার ধৈর্য, সাহসিকতা নেই, সেখানে সঠিক তা'লীম-তরবিয়ত আর শিক্ষা-দীক্ষার আশা করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন কল্পনা করা অনুচিত।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারকে সজাগ ও সচেতন করতে হবে। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনের অনুপ্রেরণা জাগাতে হবে। পরস্পরের মধ্যে দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার উৎসাহ প্রদান করতে হবে। যাতে করে প্রথমে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের মধ্যে সে সকল গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত করে, তারপর তাদের সন্তানদেরকে সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করতে পারে। কারণ, হারিয়ে যাওয়া বা অস্তিত্বহীন বস্তু কোনো কিছু দিতে পারে না। তেমনিভাবে যে সংস্কার বা পরিবার হিংসা-বিদ্বেষ আর ঝগড়া-বিবাদের কারণে ভেঙ্গে গেছে বা

ধ্বংস হয়ে গেছে, সে পরিবার থেকে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা তা'লীম-তরবিয়তসহ ভালো কিছুর আশা করা যায় না। বরং সে সব পরিবারে ফিতনা-ফ্যাসাদ, অ-শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা আর অপরাধের প্রবণতা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

এজন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী একটি পরিবারের আদব-শিষ্টাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা, তা'লীম তরবিয়তসহ আত্মিক ও মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, একটি পরিবার হচ্ছে সঠিক ও শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রথম ফাউন্ডেশন বা ভিত্তিপ্রস্তর। একটি জাতির অগ্রগতি উন্নতি, সংস্কার পরিশোধন ইত্যাদি সার্বিক বিষয়াবলী নির্ভর করে পরিবারের ওপর। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তাবিদ গবেষক, সংস্কৃতি-বিদ ও পরিশোধকদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও বিষয়াবলীর প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করতে হবে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় সভা, সেমিনার ও আলোচনা-পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পারিবারিক বিষয়াবলীকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে বিশেষ প্রোগাম ও সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে সমাজের কোনোও মানুষ বা সদস্যই পারিবারিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অজ্ঞ আর মূর্খ না থাকে। সমাজের প্রতিটি সদস্য যেন সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

বিবাহ বন্ধন:

তেমনিভাবে সমাজের যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথ ও পন্থাকে সহজসাধ্য করবে হবে এবং যুবক-যুবতীদেরকে বিবাহ বন্ধন ও পরিবার গঠনের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। তাদের জন্য সঠিক পরিবার গঠনের উপযোগী বিশেষ সভা সেমিনার আলোচনা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

তেমনিভাবে পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষ করে যুবক যুবতীদেরকে সঠিকভাবে সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন, তা'লীম-তরবিয়তের বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের সে বিষয়াবলীর প্রতি সচেতন করে তুলতে হবে। যুবক-যুবতী, পরিবার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ বিশেষ বই পুস্তক ইত্যাদি রচনা করতে হবে। তাদের সার্বিক বিষয়ের সকল সমস্যার কারণ নির্ণয় করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সাধারণত শিশুদের আত্মিক মানসিক ও জৈবিক দিকগুলো অনুধাবন না করে, তাদের বয়সের স্তর অনুযায়ী তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা না করে, শুধুমাত্র ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতা দিলেই চলবে না। এতে তাদের আত্মিক ও মানসিক গঠন পূর্ণ হবে না। বরং কোনো কোনো সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। এ অযৌক্তিক ভালোবাসাই সন্তানদের ক্ষতি সাধনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদেরকে ফিতনা-ফ্যাসাদ, পাপ-পঙ্কিলতা আর অপরাধ-প্রবণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাদের অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

এজন্য সঠিক ফলপ্রসূ দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা হচ্ছে সন্তান ও শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী তাদের আত্মিক মানসিক, জৈবিক এবং শারীরিক অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের প্রতি দয়া

অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা প্রদান করা। তাদের পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করা। তাহলেই তাদের প্রতি সঠিক ভালোবাসা হবে এবং সে ভালোবাসা ফলপ্রসূ হবে।

তরবিয়তী জ্ঞানের কার্যক্ষমতা:

আমরা এখানে তরবিয়তী জ্ঞান সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ কিছু অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করব, যাতে একজন অভিভাবক, বাবা-মা, মুরব্বী কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে বাস্তব কোনো শিক্ষা প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদান করতে পারেন। এমন কি তাদের নিজেদের মাঝে যদি এমন কোনো অভ্যাস বা মন্দ স্বভাব থাকে, যা তারা পছন্দ করেন না, তাহলে তা এড়িয়ে কীভাবে তাদের সন্তান ও শিশুদের উত্তম আখলাক চরিত্র শিক্ষা দিতে পারেন। অথবা এমন কোনো গুণ যা অভিভাবকের মধ্যে নেই, অথচ তাদের সন্তানদের তা শিক্ষা দিয়ে উত্তম ও সুন্দর চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে পারেন।

সাধারণতঃ শিশুরা তাদের চতুষ্পার্শ্বের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুসরণ করে থাকে, বিশেষ করে তার পরিবার ও বাবা-মা এবং অভিভাবকদেরকে অনুসরণ করে। কারণ, বাবা-মায়ের ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই তারা বড় হতে থাকে। সেখানে যদি বাবা-মা বা অভিভাবকের কোনো খারাপ অভ্যাস থাকে, তাহলে তার সন্তানকে কীভাবে তা এড়িয়ে বা না শিখিয়ে ভালো চরিত্র ও অভ্যাস শিখাতে পারে, সেখানেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন কোনো বাবা-মা যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকে, আর সে যদি চুপচাপ বসে ধূমপান করতে থাকে, তাহলে তার সন্তানও অবশ্যই বাবা-মায়ের অনুসরণ করে ধূমপান করতে শুরু করে দিবে। আর যদি শিশুকে শুধুমাত্র এমনিতেই অথবা ধমক দিয়ে নিষেধ করে, তাহলে সেই শিশু সন্তানের ধূমপান বা নিষেধ-কৃত অভ্যাসের প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, সে চুপে চুপে গোপনে হলেও ধূমপান করার চেষ্টা করবে।

এমনকি এক পর্যায় তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ধূমপান থেকে বিরত রাখা যাবে না। আর যদি বাবা-মা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে, তাকে সঠিকভাবে আদর যত্ন আর স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে তার সামনেই সিগারেট বা হিক্কা নিয়ে বসে আর তার ছোট শিশুকে এই ধূমপানের ক্ষতিকারক দিকগুলো তার সামনে তুলে ধরে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনার প্রমাণ করে এবং অচিরেই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে। আর তার শিশু যদি এ সকল অনুতাপ, ভুলের স্বীকার ও ছেড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শুনতে থাকে, তাহলে ঐ শিশু আর ধূমপান করতে যাবে না। তারপরও যদি কাজ না হয়, সুফল না পাওয়া যায় তাহলে সময় সুযোগে সিগারেট অথবা হুক্কার তামাক বা ধোঁয়ার কালো দু' একটি স্পট বা দাগ তার শরীরে বা সাদা কাপড়ে লাগিয়ে তাকে দেখানোর চেষ্টা করেন আর তাকে বলেন যে এ ধরণের কালো কালো অসংখ্য দাগ ধূমপায়ীদের ভেতরে বুকে ফুসফুসে ইত্যাদিতে লেগে থাকে। দাগ পড়তে পড়তে এগুলোর কার্যক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সর্দিকাশি, বুক ব্যথা, যক্ষ্মাসহ নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি করে। অবশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাহলে ঐ শিশু আর কখনো ধূমপানের কাছে যাবে না। এভাবেই একজন বাবা-মা, অভিভাবক তার সন্তানকে খারাপ ও বদ অভ্যাস থেকে অনায়াসে বিরত রাখতে পারেন। একজন বাবা-মা, অভিভাবক ও মুরব্বী হচ্ছে সন্তানদের জন্য বা শিশুদের আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য। অনেক সময় বাবা-মা ও অভিভাবক কিছু কিছু আত্মিক ও বাহ্যিক আখলাক চরিত্র নিয়ে অবহেলা করে থাকেন, যা ঠিক নয়। কারণ, এর জন্যই একটি সন্তানের আদর্শ চরিত্র নষ্ট হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। যাকে

পরবর্তী সময়ে সংশোধন করা বা সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের উত্তম চরিত্র ও সৎ অভ্যাসে তা‘লীম-তরবিয়ত যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে।

এ জন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদের উচিৎ তাদের সন্তানদের যথোপযুক্ত, আদর-সোহাগ, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে নিজের কাছে রাখা এবং উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া, বুঝিয়ে সমঝিয়ে খারাপ চরিত্র থেকে বিরত রাখা। সবসময় নিজেদের কাছে রাখা, যাতে তারা খারাপ ও অভদ্র স্বভাবের লোকদের সাথে মিশতে না পারে। তাহলেই তাদেরকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, টিভি বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠান অবলোকন করা। আমরা অনেক সময় পর্যবেক্ষণ করেছি যে, আধুনিক টিভি চ্যানেলগুলোতে অনেক সময় কু-রুচিপূর্ণ ও অশালীন প্রোগ্রাম ও বার্তা প্রচার করে, এমনকি কোনো কোনো সময় আমল-আখলাক চরিত্র বিধ্বংসী প্রোগ্রাম পর্যন্ত প্রচার করে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় ভালো প্রোগ্রামের ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝে খারাপ প্রোগ্রাম ও কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা খুব সহজেই ছোটদেরকে প্রভাবিত করে ফেলে। এমতাবস্থায় শিশুদেরকে কীভাবে সঠিক তা‘লীম-তরবিয়ত ও সৎচরিত্র শিক্ষা দেওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।। একদিকে যেমন টিভি বা টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলো বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা যাচ্ছে না, কারণ আজকের আধুনিক যুগে টেলিভিশন মানুষের জীবনের সাথে মিশে গেছে এবং যুগের চাহিদা-নুযায়ী চ্যানেলগুলোতে, এমন কিছু শিক্ষা, বিনোদন ও সভ্যতা, সংস্কৃতিমূলক প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে যা থেকে দূরে থাকাও কঠিন।

অপরদিকে খারাপ ও আসল চরিত্র ধ্বংসকারী প্রোগ্রামগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায় না, তাহলে শিশুদেরকে কীভাবে ভালো ও সৎচরিত্রবান রাখা যাবে।

এমতাবস্থায় বাবা, বা অভিভাবকের উচিৎ ও কর্তব্য হচ্ছে প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের ভালো দিকগুলো বুঝিয়ে দেওয়া এবং ভালো দিকগুলোর দিকে ধাবিত করে দেওয়া। প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তা সম্ভব না হলে প্রোগ্রামের পর তাকে উত্তম চরিত্রের আলোকে বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে খারাপ চরিত্রের প্রভাব তার থেকে দূর হয়ে যায়। কারণ, সাধারণত শিশুরা কি দেখল যেটি বড় বিষয় নয়। বরং তাকে কি বুঝানো হলো সেটি বড় বিষয়। তেমনিভাবে শিশুরা বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে। তাদের কাছে থাকে ও তাদের কথানুযায়ী চলতে ভালোবাসে। এজন্য তাদের কথাই তারা মানে।

আর যে সকল প্রোগ্রামে শুধু খারাপ দিকই রয়েছে সেগুলো থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাদেরকে নসিহত উপদেশের মাধ্যমে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মতো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বিশেষ খারাপ প্রোগ্রাম থেকে বিরত রাখতে হবে। তাদের সঠিক তা‘লীম-তরবিয়তের মাধ্যমে সকল প্রতিকূল ও নেতিবাচক প্রভাবের মোকাবেলা করার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। তাহলে তারা নিজেরাই সে সকল খারাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

তা‘লীম-তরবিয়তের ব্যাপারে আমার এ লেখাটি যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব পাচ্ছে, সে বিষয়টি হচ্ছে ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক, মুরব্বী ও পরিশোধকদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম যা মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বাবা মা, অভিভাবকদেরকে সঠিক

ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি, মূল্যবোধের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে ও ইসলামী বক্তব্য তুলে ধরার জন্য উৎসর্গ করছে, তাদের সামনে কুসংস্কার, সত্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছে। তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সঠিকভাবে তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করতে এবং তাদের চরিত্রবান হিসেবে এবং তাদের আত্মিক ও মানসিক গঠন ও উন্নয়ন করতে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। সে দিকটি এ লিখনিতে প্রাধান্য পাচ্ছে। এ সহায়তার প্রভাব তাদের সন্তানদের মধ্যে পড়েছে তথা গোটা জাতির মধ্যে পড়েছে। তাদের মধ্যে আদল-ইনসাফ, ন্যায়-নীতি, সঠিক ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, ধৈর্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনার প্রবণতা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

তবে এখানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে শত শত হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বই পুস্তক তা'লীম-তরবিয়তের বিষয়ে রয়েছে, যে বই পুস্তকগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের তথাকথিত আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেক বাবা-মা, অভিভাবকদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়তের পদ্ধতি নিয়ম-নীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। যার ফলে বাবা মা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তান সন্ততি ও শিশুদেরকে সঠিকভাবে তা'লীম- তরবিয়ত প্রদান করতে পারছেন, তাদের ডাকে ও প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারছেন। কিন্তু আমাদের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ইসলামিক লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে অধিকাংশ লাইব্রেরিতে তা'লীম-তরবিয়ত বিষয়ক এবং সঠিকভাবে পরিবার গঠন বিষয়ক বই, নেই বললেই চলে। সেখানে দু' একটি পাওয়া গেলেও তা উল্লেখ করার মত নয়। সেখানে রয়েছে ওয়াজ নসিহত আর উপদেশ

ইত্যাদি। অথবা সেখানে রয়েছে সে সকল কিতাব ও বই-পুস্তক, যেগুলো বিবাহ বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক, অসিয়ত সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কীয় ফিকহ ও আইন-কানূন বিষয়ক। সেখানে মানবিক সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্ক তা'লীম-তরবিয়ত বিষয়ক বই পাওয়া যায় না। অথচ এগুলোর প্রতি উম্মাহ-জাতি ও সকল মানুষ অধিক মুখাপেক্ষী। আইন-কানূন বিষয়ক বই পুস্তকের প্রতি সাধারণ মানুষ এত মুখাপেক্ষী নয়। তাদের যেগুলোর প্রয়োজন নেই, সেগুলো কাজী, বিচারক, হাকিম ও উকিল মুখতারদের জন্য প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে তাদের কাছে যাবে এবং সেখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সমাধান নিয়ে আসবে।

এজন্য তা'লীম-তরবিয়ত ও সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং পরিবার গঠন ও পারিবারিক সম্পর্কের অগ্রগতি সাধনসহ ইত্যাদি নানা বিষয় ও সমস্যাবলীর একটি ইসলামিক সমাজতাত্ত্বিক কার্যকরী সমাধানের প্রয়োজন। যার মাধ্যমে দিক- দিগন্তের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সকল চ্যালেঞ্জ আর প্রতিরোধের মোকাবেলা করে ইসলামী তা'লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

একজন শিক্ষক পরিবারের সহযোগী:

শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত শিক্ষা-দীক্ষা দান, আত্মিক ও মানসিক অনুপ্রেরণা দান এবং সার্বিক কল্যাণ কামনা একমাত্র বাবা-মা, অভিভাবক ও পরিবারই সর্বাধিক-ভাবে করে থাকে। তার পাশাপাশি শিক্ষকরা তাদের সহযোগী হিসেবে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। তারাই বাবা-মা ও পরিবারের ন্যায় শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত এবং আত্মিক-মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে। কারণ, বর্তমান সমাজ সাধারণত তাদের হাতে শিশু সন্তানদের ন্যস্ত করে দেন। শিক্ষকরাই

তা'লীম-তরবিয়তের মাধ্যমে তাদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে থাকেন।

এজন্য শিক্ষকদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার প্রভাব শিশুদের ওপর পড়ে থাকে। বাবা-মা ও পরিবারের তা'লীম-তরবিয়ত আর চেষ্টা প্রচেষ্টার নিয়ম পদ্ধতি যদি শিক্ষকের তা'লীম-তরবিয়ত, নিয়ম-পদ্ধতির সাথে মিলে যায় বা বিপরীত ধর্মী না হয়, তাহলে খুব সহজেই তাদের তা'লীম-তরবিয়ত ও চেষ্টা প্রচেষ্টা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে শিক্ষকদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-পদ্ধতিগত দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি এবং পশ্চিমা পরিকল্পনার অন্ধ অনুকরণের ফলে শিশুদের তা'লীম-তারবিয়াতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। নানা ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমাদের সন্তান ও শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ আশানুরূপ হচ্ছে না।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষক এবং সাধারণ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক বিষয়ক সমস্যায় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম-নীতি, সিস্টেম পদ্ধতি ইত্যাদি জাতির বিবেকবান ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে সকলের সমন্বয়ে যথাযথ একটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। যাতে আমাদের শিশু সন্তানদেরকে সঠিকভাবে তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়।

একজন শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা ও পরিবারের ন্যায় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা শিশু সন্তানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে সঠিক

তা‘লীম-তরবিয়তের মাধ্যমে তাকে সফলতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষক একটি শিশুকে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতায় পৌঁছানোর ভূমিকা পালন করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনসহ সার্বিক বিষয় পরিতৃপ্ত ও সচেতন না হবে, তেমনিভাবে তা‘লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সিলেবাস, কারিকুলাম, নিয়ম-পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকবে।

এজন্য জাতির বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ, চিন্তাবিদ, গবেষক, পরিশোধক এবং শিক্ষাবিদদেরকে অবশ্যই শিক্ষকদের সার্বিক মান-উন্নয়নসহ সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূরীভূত করার জন্য একান্ত সহযোগিতা করতে হবে।

জ্ঞান ও অনুভূতির সম্পর্ক:

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শেষ নেই। প্রতিদিন নিত্য নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার, উন্নতি অগ্রগতি আর অগ্রযাত্রা চলছে। পৃথিবীর মানুষ আজীবন জ্ঞান বিজ্ঞানের পিছনে লেগেই আছে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুসন্ধান চলছেই। এজন্যই বলা হয় ‘জন্ম থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হবে’। কিন্তু মানুষের আবেগ অনুভূতি ও বিবেকের রয়েছে একটি সীমারেখা ও পরিধি। মানুষের বয়সের স্তর অনুযায়ী তার আবেগ-অনুভূতি ও বিবেক হয়ে থাকে। এ জন্য মানুষের আবেগ অনুভূতি আর বিবেকটাই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তা‘লীম-তরবিয়তের মূলভিত্তি হয়ে থাকে। এমনকি তার আখলাক-চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নির্ভর করে তার বিবেক ও আবেগ অনুভূতির ওপর। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও বিবেকের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিশুদের তা‘লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে

হবে। এমনকি কুরআন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং তাদের আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতা-নুযায়ী তা'লীম- তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যই বলা হয় 'স্থান ও কাল অনুযায়ী বক্তব্য হয়ে থাকে' ।

মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও বিবেকের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ককে বাস্তব একটি উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, কীভাবে মানুষের অনুভূতির ওপর তার অর্জিত বা তার ওপর পতিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, আমাদের সমাজের ধর্মীয় জ্ঞান-প্রদানের অবস্থা বা পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমেই তাকে কুরআনের ৩০তম পারাকে এলোমেলো ও অপরকল্পিতভাবে শিখতে দেওয়া হয়। তারা মনে করে ৩০তম পারার সূরাগুলো ছোট ছোট হওয়ার কারণে সহজেই শিশুরা মুখস্ত ও আত্মস্থ করতে পারবে। অথচ তারা অন্য দিকটি খেয়াল করে নি যে, শিশুর আবেগ-অনুভূতি ও বিবেক কতটুকু হয়েছে, সে ভালোভাবে কথাই বলতে পারছে না। আর কুরআনের ৩০তম পারার অধিকাংশ সূরা ইলমে গায়েব ও আকীদা সংক্রান্ত মক্কী সূরা, সেগুলো কীভাবে শিশুরা তার ক্ষুদ্র বিবেক দিয়ে অনুধাবন করতে পারবে। এজন্য শিশুদেরকে তার বিবেক অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার মক্কী সূরাগুলোতে অধিকাংশ আয়াতেই কাফির, মুশরিক, সীমা লঙ্ঘনকারী হঠকারী ও আল্লাহ রাসূল ও কুরআন তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের অস্বীকার ও হঠকারিতার ইহকালীন পরিণাম আল্লাহর 'আযাব,

গযব ও শাস্তি এবং পরকালীন ভয়াবহ পরিণাম জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যন্ত সাবলীল ও অলংকৃত ভাষার মাধ্যমে তাদের হঠকারিতা আর সীমালঙ্ঘনের প্রতি ধমক ও ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। যেগুলো একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্যও সহজসাধ্য নয়। প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন, তাদের সামনে কাফির মুশরিক ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম তুলে ধরার প্রয়োজন। যাতে তারা সে বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে সেখানে গভীর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা করতে পারে। নিজেকে এ ভয়াবহ পরিণাম আল্লাহর 'আযাব, গযব ও শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। নিজেদের কল্যাণের পথ বেছে নিতে পারে।

কিন্তু যদি কুরআনের বর্ণিত কাফির মুশরিক ও সীমালঙ্ঘন কাফেরদের অবস্থা, তাদের শাস্তি, আযাব ও গযব এবং তাদের সম্পর্কে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের বক্তব্যটি ছোট শিশুদের অনুধাবন তো দূরের কথা, যে ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না, সে কীভাবে কুরআনের এ বক্তব্যটি অনুধাবন করতে পারবে, কীভাবে আল্লাহর এ ডাকে সাড়া দিবে। বরং তার সামনে এ বক্তব্যটি তুলে ধরলে বা শিক্ষা দিলে শিশুর হৃদয়ে ভয়-ভীতি আর ত্রাসের সঞ্চার হবে। তার আত্মিক ও মানসিক অনুভূতি হ্রাস পাবে। তার বিবেক বুদ্ধি, বীরত্ব ও সাহসিকতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার ভেতরে চেতনা ও উদ্ভাবনী শক্তি জন্মাবে না। তার পুরো জীবনটাই ভীতির সন্মুখীন হয়ে যাবে। সে না পারবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে, না পারবে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে। না পারবে পরকালে মুক্তির জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে, অথচ আল্লাহ মুমিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য। যদিও সে চুরি করে, ব্যভিচার করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: " وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: " وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: " وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিল, তার সাথে কাউকে শরীক করল না, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আবূ দারদা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি চুরি করে এবং যদি সে ব্যভিচার করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে। আমি আবারও বললাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে চুরি করে যদিও সে ব্যভিচার করে। যদিও আবূ দারদার তা অপছন্দ”।[7] কারণ, আল্লাহ তার বান্দার আমলসমূহ সামগ্রিকভাবে বিচার করবেন। শুধুমাত্র পাপের বিচারই করবেন না, বরং পাপ-পুণ্য উভয়ের হিসাব নিবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤﴾ [هود: ١١٤]

---

[7] মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং ২৭৪৯১।

“পূণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটা এক মহা স্মারক”। [সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪]

হতে পারে অমুক মানুষেরই তার পাপ কর্ম পুণ্য কাজের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। হতে পারে অনেক মানুষেরই পুণ্য কাজ পাপ কর্মের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। সে জান্নাতে শান্তিতে বসবাস করবে। এজন্য শিশুদেরকে শিশু বয়সে কুরআনের এ ধরনের ভীতিমূলক বক্তব্য ও তা‘লীম-তরবিয়ত প্রদান তার দায়িত্ব-অনুভূতি হ্রাস করে পাপ কাজের প্রতি ধাবিত করে ফেলতে পারে। এজন্য শিশুদেরকে এ ধরনের ভীতিমূলক নেতিবাচক বক্তব্য শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে কাফির মুশরিক আর সীমালঙ্ঘনকারীদের ‘আযাব-গযব আর শাস্তির কথা এবং তাদের সম্পর্কে ধমক ও ভীতির কথা শোনানোর প্রয়োজন নেই, বরং তাদের বয়সের স্তর ও বিবেক-অনুভূতি অনুযায়ী তা‘লীম-তরবিয়ত প্রদান ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে।

সুতরাং বাবা-মা অভিভাবক ও মুরব্বীদের উচিৎ ও কর্তব্য হচ্ছে যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের তা‘লীম-তরবিয়ত ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাসূলের আদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে অনুসরণ করতে হবে। সে মূলনীতি ও দিক নির্দেশনার আলোকে তাদের সন্তানদের বয়সের স্তর ও বিবেক-অনুভূতি অনুযায়ী জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এ হিসেবে শিশুদের সামনে ধর্ম ও আল কুরআনের সেসব অংশ ও আয়াত শিখাতে হবে, যেসব আয়াত ও অংশ তাদের অনুভূতি ও বিবেক সমর্থন করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ ও তার রাসূলের ঈমান, বিশ্বাস এবং ইসলাম ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে, সেসব আয়াত প্রথমে তাদেরকে শিখাতে হবে। তারপর যখন শিশু তার বয়সের দ্বিতীয় স্তরে

পৌঁছে যাবে, মোটামুটি ভালোমন্দ পার্থক্য করতে পারবে, তখন তাকে ভালো কাজের আদেশ, খারাপ কাজের নিষেধ এবং সাধারণ ছোটখাটো পাপ করা যেমন মিথ্যা বলা, অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা ও ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দানকারী আয়াত ও সূরাসমূহ শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তার হৃদয়ে কোনো ভয়ভীতির সঞ্চার না হয়ে ভালো কাজের প্রতি নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারে। তারপর যখন বয়সের তৃতীয় স্তরে পৌঁছাবে, তখন তাকে বড় বড় পাপ কাজ ও অশালীন আচার ব্যবহার থেকে বিরত রাখা, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং কোনো কারণে ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে মা প্রার্থনা, তাওবা-ইস্তেগফার ও আল্লাহর রহমত কামনামূলক আয়াতগুলো শিক্ষা দিতে হবে; যাতে তার মধ্যে কোনো সন্ত্রাসমূলক প্রভাব বিস্তার না হয় এবং তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন হতে পারে। তারপর যখন শিশু প্রাপ্ত বয়সে পরিণত হবে, তখন তার সামনে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং দায়িত্ব অনুভূতিতে ফাঁকি দিলে বা যথাযথভাবে আদায় না করলে তার পরিণতি ও আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি ‘আযাব গযব ইত্যাদি সম্পর্কীয় আয়াত ও সূরাগুলো শিক্ষা দিতে হবে; যাতে একটি শিশু সার্বিক দিক দিয়ে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতামূলক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। যেমনি-ভাবে গড়ে তুলেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে তথা গোটা আরব জাতিকে। তারা তাদের নিজেদেরকে গঠন করে তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে যথাযথভাবে বীরত্বের সাথে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

শিশুদের তা‘লীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক একটি বিষয়, যার মাধ্যমে শিশুদেরকে সঠিক ইমান

আকিদা, আখলাক-চরিত্র, ধর্ম-বিশ্বাস এবং আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশ সাধন করা যায়। এজন্য শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ এবং তা'লীম-তরবিয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তাহলেই তাদের থেকে ভয়ভীতি, ত্রাসসহ সকল প্রকার নেতিবাচক প্রভাব দূরীভূত হয়ে সম্মান-মর্যাদা, বীরত্ব, ইতিবাচক প্রভাব ও কোমল মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠবে এবং সমাজের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে তাদের বিবেক অনুভূতির সাথে জ্ঞানের সম্পর্ককে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। এমনকি কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সে বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা। তার বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতা ও বিবেক অনুপাতে প্রথমে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা, দেশ-জাতির মহব্বত, ইমান-বিশ্বাস, আকিদা সম্পর্কীয় আয়াত ও সুরাগুলো শিক্ষা দেওয়া। তারপর তাকে উত্তম আমল-আখলাক, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। তারপর তাকে তার ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে এবং দায়িত্ব কর্তব্য অনাদায়ে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, গযব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াত ও সূরাগুলো শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে একটি শিশু তার আত্মিক ও মানসিক যে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ভয়ভীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে নিজেকে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন সঠিক মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

এভাবে যদি প্রতিটি বিষয়ে তা'লীম-তরবিয়ত, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহ সবকিছুই শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি-অনুভূতি শক্তি অনুযায়ী প্রদান করা হয় তাহলে প্রতিটি শিশু আত্মিক ও মানসিকসহ সার্বিক বিষয়ে ইতিবাচক যোগ্যতা ও প্রভাব নিয়ে বেড়ে উঠবে। এটিই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত শিশু শিক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়তের মূল ভিত্তি ও লক্ষ্য। সে বিষয়টি আমাদেরকে ভালো ও গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। শিশু-শিক্ষা তথা আমাদের তা'লীম-তরবিয়তের কারিকুলাম ও সিলেবাস দেশ-জাতি, গোত্র-বংশ নির্বিশেষে সকলের জন্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে নারী-পুরুষ, জাতি-গোষ্ঠী উত্তম, অধম ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ নেই, সকলেই ভাই ভাই একই আদমের সন্তান, সকলেই মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের সৈনিক।

এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও সকল জাতি গোষ্ঠীর অভিভাবক, মুরুব্বী, চিন্তাবিদ গবেষক, শিক্ষক, সংস্কারক ও পরিশোধকদের ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে এবং সংগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিশুদের আত্মিক মানসিক ও মৌলিক বিকাশ ঘটিয়ে তাদের শক্তিশালী করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভিত্তি মজবুত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব মহলে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মুরুব্বী চিন্তাবিদ, সাংস্কৃতিবিদ, সংস্কারক, সংস্কারক ও চিন্তাবিদদেরকে সাধারণ শিক্ষক, সাধারণ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব ও পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের জন্য সঠিক ঈমান আকিদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমল-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে বই পুস্তক প্রকাশসহ আদব-শিষ্টাচারের ব্যবস্থা করে

দিতে হবে। সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন ব্যক্তিকে যখন সঠিক ঈমান আকিদা-আখলাক-চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসহ গোটা সমাজ এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে। ইসলামের ভিত্তি মজবুত হয়ে যাবে। সকলেই তখন সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ, মূলনীতির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিবে।

এমনকি তখন মানুষের কথার সাথে কাজের মিল থাকবে। তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক থাকবে। সকলেই একযোগে সাহায্য সহযোগিতা আর পরামর্শ-ভিত্তিক সামাজিক কাজ শুরু করে দেবে। তখনই বলিষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন, সম্মানিত মুমিন মুসলিম নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের এক সাথে কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।